মহানগর

প্রেমেন্দ্র মিত্র

আমার সঙ্গে চলো মহানগরে—যে-মহানগর ছড়িয়ে আছে আকাশের তলায় পৃথিবীর ক্ষতের মতো, আবার যে-মহানগর উঠেছে মিনারে মন্দিরচূড়ায়, আর অভ্রভেদী প্রাসাদ-শিখরে তারাদের দিকে, প্রার্থনার মতো মানবাত্মার।

আমার সঙ্গে এসো মহানগরের পথে, যে-পথ জটিল, দুর্বল মানুষের জীবনধারার মতো, যে-পথ অন্ধকার, মানুষের মনের অরণ্যের মতো, আর যে-পথ প্রশস্ত, আলোকোজ্জ্বল, মানুষের বুদ্ধি, মানুষের অদম্য উৎসাহের মতো।

এ-মহানগরের সংগীত রচনা করা উচিত—ভয়াবহ, বিস্ময়কর সংগীত।

তার পটভূমিতে যন্ত্রের নির্ঘোষ, উর্ধ্বমুখ কলের শঙ্খনাদ, সমস্ত পথের সমস্ত চাকার ঘর্ঘর, শিকলের ঝনৎকার—ধাতুর সঙ্গে ধাতুর সংঘর্ষের আর্তনাদ। শব্দের এই পটভূমির ওপর দিয়ে চলেছে বিসর্পিল সুরের পথ ; প্রিয়ার মতো যে-নদী শুয়ে আছে মহানগরের কোলে, তার জলের ঢেউ-এর সুর, আর নগরের ছায়াবীথির ওপর দিয়ে যে-হাওয়া বয় তার, নির্জন ঘরে প্রেমিকেরা অর্ধস্ফুট যে-কথা বলে তারও। সে সংগীতের মাঝে থাকবে উত্তেজিত জনতার সম্মিলিত পদধ্বনি—শব্দের বন্যার মতো ; আর থাকবে ক্লান্ত পথিকের পথের ওপর দিয়ে পা টেনে নিয়ে যাওয়ার আওয়াজ, মধ্যরাত্রে যে-পথিক চলেছে অনির্দিষ্ট আশ্রয়ের খোঁজে।

কঠিন ধাতু ও ইটের ফ্রেমে লক্ষ জীবনের সূত্র নিয়ে মহানগর বুনছে যে বিশাল সূচিচিত্র, যেখানে খেই যাচ্ছে নিশ্চিহ্ন হয়ে হারিয়ে, উঠছে জড়িয়ে নতুন সুতোর সঙ্গে অকস্মাৎ—সহসা যাচ্ছে ছিঁড়ে—সেই বিশাল দুর্বোধ চিত্রে অনুবাদ থাকবে সে-সংগীতে।

এ-সংগীত রচনা করার শক্তি আমার নেই। আমি শুধু মহানগরের একটুখানি গল্প বলতে পারি—মহানগরের মহাকাব্যের একটুখানি ভগ্নাংশ, তার কাহিনী-সমুদ্রের দু-একটি ঢেউ। মহাসংগীতের স্বাদ তাতে মিলবে না, তৃষ্ণা তাতে মেটবার নয়,—জানি।

সংকুচিত আড়ষ্টভাবে নদীর যে-শাখাটি ঢুকছে নগরের ভেতর তারই অগভীর জলের মন্থর স্রোতে ভেসে আমরা গিয়ে উঠব নড়ালের পোলের তলায় ফুটন্ত কদমগাছের নিশান দেওয়া সেই পুরনো পোনাঘাটে। আমরা পেরিয়ে যাব পুরনো সব ভাঙাঘাট, পেরিয়ে যাব ন্যাড়াশিবের মন্দির, পেরিয়ে যাব ইটখোলা আর চালের আড়ত, কেঠোপটি আর পাঁজা-করা টালি ও ইট আর সুরকি বালির গোলা। আমরা চলেছি পোনার নৌকায়। আমাদের নৌকার খোলে টইটুম্বর জল, আর তাতে কিলবিল করছে মাছের ছানা। সেই পোনার চারা বিক্রি হবে কুনকে হিসাবে পোনাঘাটে।

আষাঢ় মাসের ভোরবেলা। বৃষ্টি নেই কিন্তু আকাশ মেঘে ঢাকা। সূর্য হয়তো উঠেছে পুবের বাঁকা নগরশিখর-রেখার পেছনে, আমরা পেয়েছি মাত্র মেঘ থেকে চোয়ানো স্তিমিত একটু আলো। সে-আলোয় এদিকে দরিদ্র শহরতলিকে আরও যেন জীর্ণ দেখাচ্ছে। ভাঙাঘাটে এখনো স্নানে বড়ো কেউ আসেনি, গোলাগুলি ফাঁকা, ধানের আড়তের ধারে শূন্য

Scanned by CamScanner

সব শালতি বাঁধা। সব খাঁখাঁ করছে।

জোয়ারের টানে ভেসে চলেছে নৌকা। মাঝিরা বড়ো নদীতে বরাবর এসেছিল দাঁড় টেনে। এখন তারা ছই-এর ভেতর একটু ঘুমিয়ে নিচ্ছে। শুধু হালে বসে আছে মুকুন্দ, আর তার কাছে কখন থেকে চুপটি ক'রে গিয়ে বসেছে যে রতন তা কেউ জানে না—সেই বুঝি রাত না পোহাতেই। নৌকা তখন মাঝ-নদীতে।

বাদলা রাতে আকাশে ছিল না তারা। রতনের মনে হয়েছে সব তারা যেন নেমেছে জলের ওপর। নদী তখন মহানগরের নাগাল পেয়েছে; দু-ধারে জাহাজ আর ষ্টীমার, গাধাবোট আর বড়ো-বড়ো কারখানার সব জেটি। অন্ধকারে তাদের রূপ দেখা যায় না, দেখা যায় শুধু গায়ে আলোর ফোঁটা, অগুনতি ফোঁটা, কালো জলের এপার থেকে ওপারে। মেঘলা আকাশ ছেড়ে তারাগুলিই তো নেমেছে নদীর ওপর।

রতন ভয়ে-ভয়ে এসে বসেছে নিঃসাড়ে হালের কাছে। কে জানে বাবা বকবে কিনা? হয়তো ধমকে আবার দেবে পাঠিয়ে ছই-এর ভেতরে! কিন্তু সে কি থাকতে পারে এমন সময় ছই-এর ভেতর—নৌকা যখন পেয়েছে মহানগরের নাগাল, আকাশের তারা যখন জলের ওপর নেমেছে! তার যে কত দিনের সাধ, কত দিনের স্বপ্ন! রতন দু-চোখ দিয়ে পান করেছে আলো-ছিটানো এই নগরের অন্ধকার আর নিশ্বাস পর্যন্ত ফেলেছে সাবধানে, পাছে বাবা টের পায়, পাছে দেয় তাকে ধমকে ভেতর পাঠিয়ে। কিছুই ত বিশ্বাস নেই। বাবা তো তাকে আনতেই চায়নি বাড়ি থেকে। ছেলেমানুষ আবার শহরে যায় নাকি? আর নৌকায় এতখানি পথ যাওয়া কি সোজা কথা! কি করবে সে সেখানে গিয়ে? কত কাকুতি-মিনতি ক'রে, কেঁদে-কেটে না রতন শেষ পর্যন্ত বাবাকে নিমরাজি করিয়েছে। তবু নৌকায় তুলে বাবা তাকে শাসিয়ে দিয়েছে—খবরদার, পথে দুষ্টুমি করলে আর রক্ষা থাকবে না। না, দুষ্টুমি সে করবে না, কাউকে বিরক্তও না। তাকে যা বলা হবে তাই করতে সে রাজি। সে শুধু একবার শহর দেখতে চায়—রূপকথার গল্পের চেয়ে অদ্ভুত সেই শহর। কিন্তু শুধু তাই জন্যে কি শহরে আসবার এই ব্যাকুলতা রতনের? আচ্ছা, সে-কথা এখন থাক।

কিন্তু রতনকে কেউ লক্ষ্য করে না, কিংবা লক্ষ্য ক'রেও গ্রাহ্য করে না। রতন বসে আছে নিঃসাড়ে, শুধু সমস্ত দেহের রেখায় ফুটে উঠেছে তার ব্যগ্রতার প্রখরতা।

ধীরে-ধীরে অন্ধকার এল ফিকে হয়ে। এবার নদী রেখায় স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। প্রথম ছিল চারিধারে আবছা কুয়াশা। প্রকৃতির পটের ওপর যেন রঙের এলোমেলো ছোপ, কোথাও একটু ঘন, কোথাও হাল্কা, সে-রঙের ছোপ তখনো নির্দিষ্ট রূপ নেয়নি। নীহারিকার মতো আকারহীন সেই অস্পষ্ট ধোঁয়াটে তরলতা থেকে রতনের চোখের ওপরেই কে যেন এইমাত্র নতুন পৃথিবী সৃষ্টি ক'রে তুলছে। আকাশের গায়ে কালো খানিকটা তুলির পোঁচ দেখতে-দেখতে হয়ে উঠল প্রকাণ্ড একটা জাহাজ, তার জটিল মাস্তুলগুলি উঠেছে ছোটোখাটো অরণ্যের মতো মেঘলা আকাশে, তার নোঙরের শেকল নেমেছে অতিকায় অজগরের মতো জলের ভেতর। রতনদের নৌকা সে-দানবের ভ্রূকুটির তলা দিয়ে ভয়ে-ভয়ে পার হয়ে যায় ছোটো শোলার খেলনার মতো। জলের আরেক ধারে বিছানো ছিল খানিকটা তরল গাঢ় রঙের কুয়াশা। সে-কুয়াশা জমাট বেঁধে হয়ে গেল অনেকগুলো গাধা-বোটের জটলা—একটি জেটির চারিধারে তারা ভিড় ক'রে আছে। দূর থেকে মনে হয়, ওরা যেন কোনো বিশাল জলচরের শাবক—মায়ের কোল ঘেঁষে তাল পাকিয়ে আছে ঘুমিয়ে। নদীর ওপরকার পর্দা

Scanned by CamScanner

আরো গেল সরে। কল-কারখানার বিশাল সব দেহ উঠল জেগে নদীর দু-পারে। জলের ওপর তাদের লৌহ-বাহু তারা বাড়িয়ে দিয়েছে। বাঁধানো পাড় থেকে বড়ো-বড়ো ক্রেন উঠেছে গলা বাড়িয়ে ; দুই তীরে সদাগরী জাহাজের আশেপাশে জেলে-ডিঙি আর খেয়া-নৌকা, ষ্টীমার আর লঞ্চ ভিড় ক'রে আছে। এই মহানগর! ভয়ে বিস্ময়ে ব্যাকুলতায় অভিভূত হয়ে রতন প্রথম তার রূপ দেখলে।

তারপর তাদের নৌকা বাঁক নিয়ে ঢুকেছে এই শাখার ভেতর, চলেছে পুরনো শহরতলির ভেতর দিয়ে। বড়ো নদীতে মহানগরের রূপ দেখে রতন সত্যি ভয় পেয়েছিল, হতাশ হয়েছিল আরো বেশি। কিন্তু এই পুরনো জীর্ণ শহরতলি দেখে তার যেন একটু আশা হয়। কেন আশা হয়? আচ্ছা, সে-কথা এখন থাক।

নদীর আরেকটা বাঁক ঘুরেই দেখা যায় নড়ালের পোল। আগে থাকতে পোনার সব নৌকা এসে জুটেছে পোনাঘাটে। মুকুন্দ হাঁক দিয়ে এবার সবাইকে ভোলে। লক্ষ্মণ উঠে তার কুনকে ঠিক করে। মাঝিরা গা মোড়া দিয়ে ওঠে। আর রতন বসে থাকে উত্তেজনায় উদ্‌গ্রীব হয়ে। তার চাপা দুটি পাতলা ছোটো ঠোঁটের নীচে কী সংকল্প আছে, জানে কি কেউ? বড়ো-বড়ো দুটি চোখে তার কিসের ব্যগ্রতা? শুধু শহর দেখার কৌতূহল তো এ নয়! কিন্তু সে-কথা এখনো থাক।

পোনাঘাটে এসে নৌকা লাগে। পোনাঘাটে আর জায়গা কই দাঁড়াবার! এরই মধ্যে মাটির হাঁড়ি দু-ধারে ঝুলিয়ে ভারীরা এসেছে দূর-দুরান্তর থেকে পোনার চারা নিয়ে যেতে। তাদের ভিড়ের ভেতর পাড়ের কাদার ওপর কারা দোকান পেতে বসেছে পান বিড়ি আর তেলেভাজা খাবারের। সরকারী লোকেরা ঘুরে বেড়াচ্ছে পাওনা আদায় করতে। দালালেরা ঘুরছে হাঁকডাক ক'রে।

পাড়ে আর জায়গা নেই, তবু মুকুন্দদাসের খাস নৌকার একটু নোঙর ফেলবার ঠাঁই মেলে। মুকুন্দ তো আর যে-সে লোক নয়। বর্ষার ক'টা মাসে তার গোটা ছয়েক পোনার নৌকা আনাগোনা করে এই পথে।

মাঝিরা এর মধ্যেই নৌকার খোল থেকে জল ছেঁচে ফেলতে শুরু করেছে একটু-আধটু। লক্ষ্মণ কুনকে পরখ করছে—মাছ মেপে দেবার সময় খানিকটা জল রেখে হাত সাফাই করতে সে ওস্তাদ। মুকুন্দদাস নৌকা থেকে জলে নেমে ডাঙায় ওঠে। পেছন দিকে হঠাৎ চোখ পড়ায় ধমক দিয়ে বলে—'তুই নামলি যে বড়ো!'

রতন বাবার দিকে কাতরভাবে তাকায়। মুকুন্দ একটু নরম হয়ে বলে—'আচ্ছা, কোথাও যাসনি যেন, ওই কদমগাছের তলায় দাঁড়াগে যা!'

রতন তাই করে। কদমগাছ থেকে অসংখ্য ফোটা ফুল ঝরে পড়েছে মাটিতে। কাদায় মানুষের পায়ের চাপে রেণুগুলো থেঁতলে নোংরা হয়ে গেছে। পোনা-চারার হাটে কদমফুলের কদর নেই।

রতনের চারিধারে হট্টগোল।

'চাপড়াও না হে, নইলে বাড়ি গিয়ে মাছচচ্চড়ি খেতে হবে যে।'

'একটা নতুন হাঁড়িও জোটেনি! ভাতের তিজেলটাই এনেছ বুঝি টেনে। তারপর মাছ যখন ঘেমে উঠবে তখন হবে দালাল বেটার দোষ।'

Scanned by CamScanner

ভারীরা কেউ এসেছে খালি হাঁড়ি নিয়ে, কারুর কেনা প্রায় সাঙ্গ হ'ল। বসে-বসে তারা হাঁড়ির জল চাপড়ায়, মরা মাছ ছেঁকে ফেলে। নদীর ধারের কাদায় মরা মাছ আর কদম-রেণু মিশে গেছে।

রতন কিন্তু কদমতলায় বেশিক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকে না। এখানে থাকবার জন্যে কাকুতি-মিনতি ক'রে সে তো শহরে আসেনি। সারা পথ সে মনের কথা মনেই চেপে এসেছে। মুখ ফুটে একবার বুঝি লক্ষ্মণকে গোপনে চুপিচুপি জিজ্ঞাসা করেছিল—'হ্যাঁ কাকা, পোনাঘাটের কাছেই উল্টোডিঙি, না?'

লক্ষ্মণকাকা হেসে বলেছে—'দূর পাগলা, উল্টোডিঙি কি সেথা! সে হ'ল কতদূর।' তারপর অবাক হয়ে জিজ্ঞাসা করেছে—'কেন রে, উল্টোডিঙির খোঁজ কেন? উল্টোডিঙির নাম তুই শুনলি কোথা?'

কিন্তু রতন তারপর একেবারে চুপ। তার পেটের কথা বার করে কার সাধ্য।

কদমতলায় দাঁড়িয়ে উৎসুকভাবে রতন চারিদিকে তাকায়। তার বাবা কাজে ব্যস্ত, রতন একসময়ে বেরিয়ে পড়ে রাস্তায়। কাউকে কিছু জিজ্ঞাসা করতে এখানে তার সাহস হয় না। একটা দিক খেয়ালমতো ধরে সে এগিয়ে যায়।

মহানগরের বিশাল অরণ্যে কত মানুষ আসে কত কিছুর খোঁজে ; —কেউ অর্থ, কেউ যশ, কেউ উত্তেজনা, কেউ বা বিস্মৃতি। মৃত্তিকার স্নেহের মতো শ্যামল একটি অসহায় ছেলে সেখানে এসেছে কিসের খোঁজে? এই অরণ্যে নিজের আকাঙ্ক্ষিতকে সে খুঁজে পাবার আশা রাখে—তার দুঃসাহস তো কম নয়।

অনেক দূর গিয়ে রতন সাহস ক'রে একজনকে পথ জিজ্ঞাসা করে। লোকটি অবাক হয়ে তার দিকে তাকায়, বলে—'এ তো অন্য দিকে এসেছ ভাই, উল্টোডিঙি ওইদিকে, আর সে তো অনেক দূর!'

—অনেক দূর! তা হোক, অনেক দূরকে রতন ভয় করে না। রতন অন্য দিকে ফেরে।

লোকটি কি ভেবে তাকে জিজ্ঞাসা করে—'তুমি একলা যাচ্ছ অত দূর! তোমার সঙ্গে কেউ নেই?'

রতন সংকুচিতভাবে বলে—'না।'

লোকটির কি মনে হয়, একটু শক্ত হয়েই জিজ্ঞাসা করে—'বাড়ি থেকে পালিয়ে যাচ্ছ না তো? উল্টোডিঙিতে কার কাছে যাচ্ছ?'

রতন ভয়ে-ভয়ে বলে ফেলে,—'সেখানে আমার দিদি থাকে।' তারপর তাড়াতাড়ি সেখান থেকে চলে যায়। লোকটা যদি আরও কিছু জিজ্ঞাসা করে, যদি ধরে নিয়ে যায় আবার তার বাবার কাছে!

এবার তা হলে বলি। রতন এসেছে দিদিকে খুঁজতে। যেখানে মানুষ নিজের আত্মাকে হারিয়ে খুঁজে পায় না, সেই মহানগর থেকে তার দিদিকে সে খুঁজে বার করবে। শহর মানে তার দিদি। বাড়িতে থাকতে সে ভেবেছে শহরে গেলেই বুঝি দিদিকে পাওয়া যায়। মহানগরের বিরাট রূপ তার সে-ধারণাকে উপহাস করেছে ; কিন্তু তবু সে হতাশ হয়নি। দিদিকে খুঁজে সে পাবেই। শিশু-হৃদয়ের বিশ্বাসের কি সীমা আছে!

কিন্তু দিদিকে খোঁজার কথা তো কাউকে বলতে নেই। দিদির নাম করাও যে বাড়িতে মানা, তা কি সে জানে না। অনুচ্চারিত কোনো নিষেধ তার শিশুমনের ব্যাকুলতাকে মূক

Scanned by CamScanner

ক'রে রেখে দেয়।

তাই সে সারা পথ এসেছে মনের কথা মনে চেপে। তাই সে একা বেরিয়েছে দিদির সন্ধানে।

দিদিকে যে তার খুঁজে বার করতেই হবে। দিদি না হলে তার যে কিছু ভালো লাগে না। ছেলেবেলা থেকে সে তো মাকে দেখেনি, জেনেছে শুধু দিদিকে। দিদি তার মা, দিদিই তার খেলার সাথী। বিয়ে হয়ে দিদি গেছল শ্বশুরবাড়ী। তবুও তাদের ছাড়াছাড়ি হয়নি। কাছাকাছি দুটি গাঁ, রতন নিজেই যখন-তখন পালিয়ে গিয়ে হাজির হয়েছে দিদির কাছে। তারপর দিদির কাছ থেকে তাকে নিয়ে আসা সোজা ব্যাপার নয়। দিদি যেখানে থাকতে পারে দিনের পর দিন, সেখানে তার বেশি দিন থাকা কেন যে দোষের তা সে কেমন ক'রে বুঝবে!

তারপর কি হ'ল কে জানে। একদিন তাদের বাড়িতে বিষম গণ্ডগোল। দিদির শ্বশুরবাড়ি থেকে লোক এসেছে ভিড় ক'রে, ভিড় ক'রে এসেছে গাঁয়ের লোক। থানা থেকে চৌকিদার পর্যন্ত এসেছে। ছেলেমানুষ বলে তাকে কেউ কাছে ঘেঁষতে দেয় না। তবু সে শুনেছে—দিদিকে কারা নাকি ধরে নিয়ে গেছে। তাকে আবার কেড়ে আনলেই তো হয়! কেন যে কেউ যাচ্ছে না তাই ভেবে তার রাগ হয়েছে। তারপর সে আরো কিছু শুনেছে; শিশুর মন অনেক বেশি সজাগ। দিদিকে কোথায় ধরে নিয়ে গেছে কেউ নাকি জানে না।

এইবার সে কেঁদেছে। কে জানে কারা নিয়ে গেছে দিদিকে ধরে! তারা হয়তো দিদিকে মারছে, হয়তো দিচ্ছে না খেতে। দিদি হয়তো রতনকে দেখবার জন্য কাঁদছে। এ-কথা ভেবে তার যেন আরও কান্না পায়!

বাবা তাকে আদর করেছেন কান্না দেখে। মাথায় হাত বুলিয়ে বলেছেন—'কান্না কেন বাবা?'

চুপিচুপি রতন বলেছে, 'দিদি যে আসছে না বাবা।'

মুকুন্দ শিশুর সজাগ মনের রহস্য না জেনে বলেছে—'আসবে বৈকি বাবা, শ্বশুরবাড়ি থেকে কি রোজ-রোজ আসতে আছে।'

রতন আর কিছু বলেনি। কিন্তু বাবা তার কাছে কেন লুকোতে চান বুঝতে না পেরে তার বড়ো ভয় হয়েছে!

তারপর একদিন সে শুনেছে যে দিদিকে নাকি পাওয়া গেছে। দারোগা সাহেব পুলিশ নিয়ে গিয়ে তাকে নাকি কোন দূর দেশ থেকে খুঁজে বার করেছেন। দিদিকে খুঁজে পাওয়া গেছে! রতনের আনন্দ আর ধরে না। দিদি এতদিন বাদে তা হলে আসছে।

কিন্তু কোথায় দিদি! একদিন, দু-দিন, ব্যাকুলভাবে রতন অপেক্ষা করে, কিন্তু দিদি আসে না। দিদিকে ফিরে পাওয়া গেছে, তবু দিদি কেন আসে না রতন বুঝতে পারে না। দিদির ওপরই তার রাগ হয়। কতদিন রতন তাকে দেখেনি তা কি তার মনে নেই। দিদি নিজে চলে আসতে পারে না? আর বাবাই বা কেমন, দিদিকে নিয়ে আসছে না কেন? রতনের সকলের ওপর অভিমান হয়েছে।

হয়তো দিদি চুপিচুপি শ্বশুরবাড়ি গেছে ভেবে একদিন সকালে রতন সেখানে গিয়ে হাজির হয়। কিন্তু সেখানে তো দিদি নাই! সেখানে কেউ তার সঙ্গে ভালো ক'রে কথাবার্তা পর্যন্ত কয় না ; দাদাবাবু তাকে দেখতে পেয়েও দূর থেকে না ডেকে চলে যান। মুখখানি

Scanned by CamScanner

কাঁদো-কাঁদো ক'রে রতন সেদিন বাড়ি ফিরে এসেছে।

ফিরে এসে বাবার কাছে কেঁদে সে আবদার করেছে—'দিদিকে আনছ না কেন বাবা?'

সেইদিন মুকুন্দ তাকে ধমকে দিয়েছে।

তারপর থেকে দিদি আর আসেনি। দিদি নাকি আর আসবে না।

কিন্তু রতন মনে-মনে জানে, তাকে কেউ ডাকতে যায়নি বলেই অভিমান ক'রে দিদি আসেনি।

রতন যে জানে না দিদি কোথায় থাকে, না-হলে সে নিজেই গিয়ে দিদিকে ডেকে আনত।

কিন্তু কেমন ক'রে সে জানবে দিদি কোথায় আছে! কেউ যে তাকে দিদির কথা বলে না। দিদির কথাই যে বলতে নেই। রাত্রে সে চুপিচুপি শুধু দিদির জন্যে কাঁদে; দিদি কেমন ক'রে তাকে ভুলে আছে ভেবে মনে-মনে তার সঙ্গে ঝগড়া করে। দিদি কোথায় থাকে সে জানে না।

কিন্তু শিশুর মন আমরা যা মনে করি তার চেয়ে অনেক বেশি সজাগ।

শিশু অনেক কিছু শুনতে পায়, অনেক কিছু বোঝে। কোথা থেকে সে শুনেছে কে জানে যে, দিদি থাকে শহরে—রূপকথার চেয়ে অদ্ভুত সেই শহর। কোথা থেকে কার মুখে শুনেছে—উল্টোডিঙির নাম। বাতাসে কথা ভেসে আসে, বিনিদ্র ভালোবাসা কান পেতে থাকে, শুনতে পায়।

তাই সে কাকুতি-মিনতি ক'রে এসেছে মহানগরে, তাই সে চলেছে সন্ধানে।

দিদিকে সে খুঁজে বার করবে, সে জানে দিদির সামনে একবার গিয়ে দাঁড়ালে সে আর না এসে থাকতে কিছুতেই পারবে না। এমনি গভীর তার বিশ্বাস।

রতনকে আমরা এখানে ছেড়ে দিতে পারি। মহানগরে অনেকেই আসে অনেক-কিছুর খোঁজে, কেউ অর্থ, কেউ যশ, কেউ উত্তেজনা, কেউ বিস্মৃতি, কেউ আরও বড়ো কিছু। সবাই কি পায়? পথের অরণ্যে তারা হারিয়ে যায়। মহানগর তাদের চিহ্ন দেয় মুছে। রতনও তেমনি হারিয়ে যাবে ভেবে আমরা তাকে ছেড়ে দিতে পারি।

কিন্তু তা যাবে না। পৃথিবীতে কি সম্ভব, কি অসম্ভব কে বলতে পারে? রতন সত্যি দিদির খোঁজ পায়। দুপুর তখন গড়িয়ে গেছে বিকেলের দিকে। আষাঢ় মাসের আকাশ, মেঘে ঢাকা বলে বেলা বোঝা যায় না। ক্লান্তপদে শুকনো কাতরমুখে একটি ছেলে গিয়ে দাঁড়ায় খোলায়-ছাওয়া একটি মেটেবাড়ির দরজায়। একটি মেয়ে তাকে রাস্তা থেকে এনেছে সঙ্গে ক'রে।

রতন অনেক পথ ঘুরেছে, অনেককে জিজ্ঞাসা করেছে পথ, শেষে সে সন্ধান পেয়েছে। ভালোবাসা কি না পারে!

খানিক আগে হয়রান হয়ে খোঁজ করতে-করতে রতন দূরে একটি মেয়েকে দেখতে পায়। উৎসাহভরে সে চিৎকার ক'রে ডাকে—'দিদি!'

মেয়েটি ফিরে দাঁড়াতেই রতন হতাশ হয়ে যায়। তার দিদি তো অমন নয়। কুণ্ঠিতভাবে সে অন্য দিকে চলে যাবার চেষ্টা করে। মেয়েটি তাকে ডেকে বলে—'শোনো।'

কাছে গেলে তার ক্লান্ত শুকনো মুখের দিকে চেয়ে জিজ্ঞাসা করে—'কাকে খুঁজছ ভাই?'

রতন লজ্জিতভাবে তার দিদির নাম বলে। মেয়েটি হেসে বলে—'তোমার দিদির বাড়ি বুঝি চেনো না, চলো আমি দেখিয়ে দিচ্ছি।'

মেটে-বাড়ির দরজায় দাঁড়িয়ে এখন মেয়েটি ডাকে—'ও চপলা, তোকে খুঁজতে কে

Scanned by CamScanner

এসেছে দেখে যা।'

ভেতর থেকে চপলাই বুঝি রুক্ষ স্বরে বলে—'কে আবার এল এখন?'

'দেখেই যা না একবার।'

চপলা দরজার কাছে এসে থমকে দাঁড়ায়। রতনের মুখেও কথা ফোটে না। দিদিকে চিনতেই তার কষ্ট হয়। দিদি যেন কেমন হয়ে গেছে।

দুইজনেই খানিকক্ষণ থাকে নিস্পন্দ হয়ে দাঁড়িয়ে। যে মেয়েটি রতনকে সঙ্গে ক'রে এনেছে সে একটু সন্দিগ্ধ হয়ে বলে—'তোর নাম করে খুঁজছিল, তাই তোর ভাই ভেবে বাড়ি দেখাতে নিয়ে এলাম! তোর ভাই নয়?'

উত্তর না দিয়ে চপলা হঠাৎ ছুটে এসে রতনকে বুকে চেপে ধরে, তারপর এদিক ওদিক চেয়ে অবাক হয়ে ধরা-গলায় বলে—'তুই একা এসেছিস!'

রতন দিদির বুকে মুখ লুকিয়ে থাকে কিছু বলে না।

মহানগরের পথে ধুলো, আকাশে ধোঁয়া, বাতাসে বুঝি বিষ। আমাদের আশা এখানে কখনো-কখনো পূর্ণ হয়। যা খুঁজি তা মেলে। তবু বহুদিনের কামনার ফলও কেমন একটু বিস্বাদ লাগে। মহানগর সব-কিছুকে দাগী ক'রে দেয়, সার্থকতাকেও দেয় একটু বিষিয়ে।

চপলা রতনকে ঘরে নিয়ে যায়। সে-ঘর দেখে রতন অবাক। মাটির ঘর এমন ক'রে সাজানো হতে পারে, এত সুন্দর জিনিস সেখানে থাকতে পারে রতন তা কেমন ক'রে জানবে? এত জিনিস দেখে সে অবাক হয়ে জিজ্ঞাসা করে প্রথম—'এসব তোমার দিদি?'

চপলার অকারণ চোখের জল তখনও শুকোয়নি, একটু হেসে সে বলে—'হ্যাঁ ভাই!'

কিন্তু দিদির ঘর যেমনই হোক তা নিয়ে মেতে থাকলে চলবে না তো। আসল কথা রতন ভোলেনি। সে হঠাৎ বলে—' তোমায় কিন্তু বাড়ি যেতে হবে দিদি!'

চপলা বুঝি একটু চমকে ওঠে, তারপর ম্লানভাবে—'আচ্ছা যাব ভাই, এখন তো তুই একটু জিরিয়ে নে!'

'কিন্তু জিরিয়ে নিয়েই যেতে হবে। আমাদের নৌকো কাল সকালেই ছাড়বে কিনা! এসব জিনিস কেমন ক'রে নেব দিদি?'

এবার চপলা চুপ ক'রে থাকে।

হঠাৎ কেন বলা যায় না, একটু ভীত হয়ে রতন জিজ্ঞাসা করে—'একটু জিরিয়ে নিয়েই যাবে তো দিদি?'

দিদির মুখে তবু কথা নেই। দিদি জিনিসপত্র নিয়ে যাবার ভাবনাতেই হয়তো রাজি হচ্ছে না ভেবে রতন তাড়াতাড়ি বলে—'এসব জিনিস একটা গোরুর গাড়ি ডেকে তুলে নেব, কেমন দিদি?'

চপলা কাতরমুখে বলে ফেলে—'আমার যে যাবার উপায় নেই ভাই।'

যাবার উপায় নেই! রতনের মুখের সব দীপ্তি হঠাৎ নিবে যায়। সঙ্গে-সঙ্গে তার মনে পড়ে যায় বাবার রাগ, মনে পড়ে বাড়িতে দিদির নাম পর্যন্ত উচ্চারণ নিষেধ। সত্যই বুঝি দিদির সেখানে যাবার উপায় নেই। বৃথাই এসেছে সে দিদিকে খুঁজতে, দিদিকে খুঁজে পেয়েও তার লাভ নেই।

তারপর হঠাৎ আবার তার মুখ উজ্জ্বল হয়ে ওঠে। বলে—'আমিও তা হলে যাব না দিদি!'

'কোথায় থাকবি?'

Scanned by CamScanner

'বাঃ, তোমার কাছে তো!' —বলে রতন হাসে ; কিন্তু চপলার মুখ যে আরও ম্লান হয়ে আছে তা সে দেখতে পায় না।

তারপর খেয়ে-দেয়ে সারা বিকাল দুই ভাই-বোনের গল্প হয়। কত কথাই তাদের আছে বলবার, জিজ্ঞাসা করবার। কিন্তু সন্ধ্যা যত এগিয়ে আসে তত চপলা কেমন অস্থির হয়ে ওঠে। একবার সে বলে—'তুই যে চলে এলি একলা, বাবা হয়তো খুব ভাবছে!'

দিদির প্রতি অবিচারের জন্য বাবার ওপর রতনের একটু রাগই হয়েছে, সে তাচ্ছিল্য ভরে বলে—'ভাবুক গে।'

খানিক বাদে চপলা আবার বলে—'এখান থেকে নড়ালের পোল অনেকখানি পথ না রতন?'

রতন এ-পথ পার হয়েই তো এসেছে। গর্বভরে সে বলে—'ওরে বাবা, সে বলে কোথায়?!'

'পয়সা নিয়ে তুই ট্রামে ক'রে, না-হয় বাসে, যেতে পারিস না?'

'বাঃ, আমি কি যাচ্ছি নাকি?'

দিদির মুখের দিকে চেয়ে সে কিন্তু থমকে যায়! দিদির চোখে জল।

মাথা নিচু ক'রে চপলা ধরা-গলায় বলে—'এখানে যে তোমার থাকতে নেই ভাই!'

রতন কিছুই বুঝতে পারে না, কিন্তু এবার তার অত্যন্ত অভিমান হয়। দিদি সেখানেও যেতে পারবে না, আবার এখানেও বলবে তাকে থাকতে নেই! আচ্ছা, সে চলেই যাবে। কখ্খনো, কখ্খনো আর দিদির নাম করবে না, বাবার মতো। ধীরে ধীরে সে বলে—'আচ্ছা, আমি যাব।'

মেঘলা আকাশে একটু আগে থাকতেই আলো এসেছে ম্লান হয়ে। চপলা উঠে তার আলমারি থেকে চারটে টাকা বার ক'রে রতনের হাতে গুঁজে দিয়ে বলে—'তুই খাবার খাস।'

চার টাকায় অনেক পয়সা, তবু আপত্তি করবার কথাও আর রতনের মনে নেই। দিদি যে এক্ষুনি তাকে চলে যেতে বলেছে তা বুঝে সে যেন বিমূঢ় হয়ে গেছে। তার সমস্ত বুক গেছে ভেঙে।

রতন আর ঘরে দাঁড়ায় না, আস্তে-আস্তে বাইরে বেরিয়ে আসে।

দিদির মুখের দিকেও আর না চেয়ে গলি দিয়ে সে বড়ো রাস্তার দিকে এগিয়ে যায়। মুখের দিকে চাইলেও হয়তো দিদির অবিশ্রান্ত চোখের জলের মানে সে বুঝতে পারত না।

চপলা পেছন থেকে ধরা-গলায় বলে—'বাসে ক'রে যাস রতন, হেঁটে যাসনি!'

রতন সে-কথা শুনতে পায় কিনা কে জানে, কিন্তু বড়ো রাস্তার কাছ থেকে হঠাৎ আবার সে ফিরে আসে। তার মুখ আবার গেছে বদলে। এইটুকু পথ যেতে কি সে ভেবেছে কে জানে।

চপলা তখনো দরজায় দাঁড়িয়ে আছে। রতন তার কাছে এসে হঠাৎ বলে—'বড়ো হয়ে আমি তোমায় নিয়ে যাব দিদি। কারুর কথা শুনব না!'

বলেই সে এবার সোজা এগিয়ে যায়। তার মুখে আর নেই বেদনার ছায়া, তার চলার ভঙ্গি পর্যন্ত সবল ; এতটুকু ক্লান্তি যেন তার আর নেই। দেখতে-দেখতে গলির মোড়ে সে অদৃশ্য হয়ে যায়।

মহানগরের ওপর সন্ধ্যা নামে বিস্মৃতির মতো গাঢ়।

Scanned by CamScanner